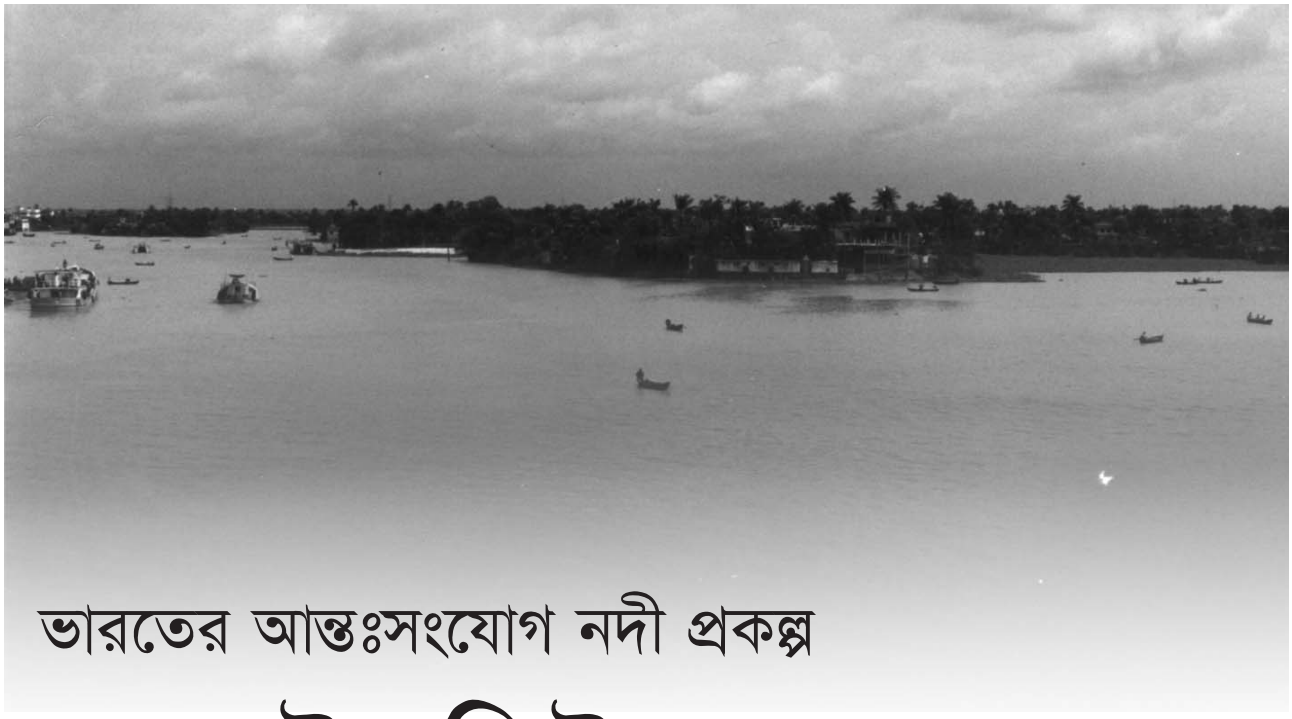

ভারতের আন্তঃসংযোগ নদী প্রকল্প

গ্যাস ট্রানজিট পাওয়ার নতুন কৌশল

রিপোর্ট : সাইফুল হাসান

বাংলাদেশ এখন দারুণ শঙ্কায়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ইতিহাসে এতো বড় শঙ্কা বা হুমকি আর কখনো আসেনি। হুমকি বা শঙ্কার কারণ দেশের অস্থিতিশীল রাজনীতি নয়। খালেদা জিয়া ও হাসিনার ঝগড়া হলে দেশবাসীর শঙ্কিত হবার কিছু ছিল না। কারণ দেশবাসী গত ২৩ বছর এটা দেখে অভ্যস্ত। বাংলাদেশের শঙ্কার কারণ রাজনীতি নয়, ভারত। ভারত ৩৭টি নদীর মধ্যে আন্তঃসংযোগ গড়ে তুলতে চাচ্ছে। এ বিষয়ে তারা একটি টাস্কফোর্সও গঠন করেছে। টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান হলেন ভারতের সাবেক পরিবেশমন্ত্রী সুরেশ প্রভু। এ সবই পুরনো খবর।

এ বিষয়ে সাপ্তাহিক ২০০০ ১১ জুলাই, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৯, ২০০৩-এ বিস্তারিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। উক্ত প্রতিবেদনে ভারতের নেয়া প্রকল্পের কারণে বাংলাদেশের সম্ভাব্য কি কি ক্ষতি হতে পারে সে বিষয়ে দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞদের মতামত তুলে ধরা হয়। সাপ্তাহিক ২০০০ রিপোর্ট প্রকাশের পর দেশের সব পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এ বিষয়ে লেখালেখি শুরু হয়। পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক লেখালেখির ফলে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ভারত সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানায়। ১৩ আগস্ট ভারতীয় হাইকমিশনের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার দিলীপ সিনহাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেকে প্রতিবাদপত্র হস্তান্তর করা হয়। প্রতিবাদপত্রে ভারতের এ প্রকল্প সম্পর্কে বাংলাদেশের উদ্বেগের কথা জানানো হয়। প্রতিবাদপত্র পাবার কয়েক দিন পর ভারত সরকার কড়া প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। ভারতীয় এ প্রকল্প নিয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এছাড়া আর কোনো অগ্রগতি নেই। জানা গেছে, আগামী ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে জেআরসির (যৌথ নদী কমিশন) বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বৈঠকে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের বিষয়টি গুরুত্ব পেতে পারে।

আন্তঃসংযোগ নদী প্রকল্প : সমালোচনা ঘরে-বাইরে

ভারতের দৈত্যাকৃতির এই প্রকল্প নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা চলছে খোদ ভারতেই। ভারতীয় সিভিল সোসাইটি বিজেপি সরকারের এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে সোচ্চার। সভা-সেমিনার, বিভিন্ন লেখায় প্রকল্পের বিরোধিতা করে তারা মতামত ব্যক্ত করছেন। এদেরই একজন সুধীরেন্দর শর্মা, পানি বিশেষজ্ঞ। তিনি তার এক কলামে ভারত সরকারের কাছে প্রশ্ন রাখেন 'প্রথমাবস্থায় জানা গিয়েছিল প্রকল্পের অর্থায়ন হবে অভ্যন্তরীণ খাত থেকে। অভ্যন্তরীণ খাতের অবস্থা যদি ভালো হয় তবে সেটি খুবই ভালো কথা। কিন্তু বিপজ্জনক প্রশ্নটি হচ্ছে- দেশের অভ্যন্তরীণ খাতের অবস্থা ভালো হলে সরকার কেন দারিদ্র্য বিমোচন ও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিদেশী দাতা সংস্থার কাছ থেকে লোন নিচ্ছে?' প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তার এক কলামে তিনি লিখেছেন, এই প্রকল্প ২৫টি রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ১০টি নদীকে সংযোগ করবে, যা আগামী দিনে আধুনিক মহাভারত গড়ে তুলবে। কিন্তু প্রশ্নে হচ্ছে, বিষয়টির সঙ্গে ২৫ জন মুখ্যমন্ত্রী ও ৫০ কোটি লোক জড়িত! এ পর্যন্ত লিখে সুধীরেন্দর শর্মা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন টেনে বাক্যের সমাপ্তি টেনেছেন। সুধীরেন্দর শর্মার না বলা কথাটি বুঝতে কারোরই কষ্ট হয় না। ২৫ জন মুখ্যমন্ত্রী আর ৫০ কোটি লোককে সন্তুষ্ট করে এই প্রকল্প সম্পাদন সম্ভব কি? এই প্রশ্নটি উক্ত বিশেষজ্ঞ করতে চেয়েছেন।

প্রস্তাবিত এই প্রকল্পের ফলে যেসব রাজ্য নিজেদের ক্ষতির আশঙ্কা করছে তারা ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানাবে বলে জানিয়েছে। সেই সঙ্গে উদ্বেগও

প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বিহারের লালু যাদব প্রসাদের প্রতিবাদের কথা জানা গেছে। কিছুদিন আগে ভারতের এক স্যাটেলাইট চ্যানেলে দেয়া সাক্ষাৎকারে লালু যাদব প্রসাদ বলেন, 'কোনোভাবেই বিহারের ওপর দিয়ে পানি পরিবহন করে অন্য রাজ্যে নিয়ে যেতে দেয়া হবে না।' শুধু রাজনীতিবিদ নন, পরিবেশবাদী সংগঠন, পরিবেশবিদ, প্রকৌশলী, পানি বিশেষজ্ঞ সাবেক সরকারি কর্মকর্তারা সুরেশ প্রভুর স্বপ্নের এই প্রকল্পের বিরোধিতা করছে। ভারতীয় পত্র-পত্রিকা ও ইন্টারনেটের কল্যাণে জানা গেছে, প্রকল্পবিরোধী একটি আন্দোলন ভারতে দানা বাঁধতে যাচ্ছে। অন্যদিকে টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান সুরেশ প্রভু সবাইকে বিশ্বাস করাতে চাচ্ছেন, প্রকল্পের অর্থায়ন যেকোনো সম্পদ থেকে হতে পারে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ১০১টি জেলা ও ৫টি মেট্রোপলিটন শহরের খাবার পানির সমস্যার সমাধান হবে।

নদী সংযোগ প্রকল্পটি প্রকৌশলীদের জন্য স্বপ্নের মতো সন্দেহ নেই। কিন্তু পরিবেশবিদ, নদী অববাহিকায় বাস করা মানুষ ও বাংলাদেশের জন্য দুঃস্বপ্নের চেয়েও বেশি কিছু। প্রকল্পটি নিয়ে ভারতে প্রচুর হৈ চৈ হলেও বাংলাদেশের অবস্থা সেই তুলনায় নীরবই বলা যায়। হাতে গোনা কয়েকজন মানুষ ছাড়া এ বিষয়ে কেউ সচেতন বলেই মনে হয় না। ভারতের এই প্রকল্পের ব্যাপারে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি সরব মিডিয়া।

মিডিয়ায় আছে, কাজে নেই কেউ

দেশের স্বার্থ সংরক্ষণে মিডিয়া বরাবরই চমৎকার ভূমিকা পালন করে। আন্তঃসংযোগ নদী প্রকল্প নিয়েও মিডিয়ার লোকজন ছাড়া আর কারও যেনো কোনো মাথাব্যথা নেই। বাংলাদেশী মিডিয়া প্রথম থেকেই ভারতের এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করে আসছে। দেশবাসী আশা করেছিল, দেশের ওপর সম্ভাব্য এই হুমকিতে দলমত নির্বিশেষে এক কাতারে দাঁড়াবে। মিডিয়া এই ইস্যুতে যে সচেতনতা গড়ে তুলছে, সরকার ও রাজনৈতিক দল, পরিবেশবিদ ও সিভিল সোসাইটি সেটাকে কাজে লাগাবে। বাস্তবে সেরকম কিছু ঘটেনি। সাম্প্রতিক সময়ে তেমন কিছু ঘটার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। ১১ জুলাই সাপ্তাহিক ২০০০-এর এ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ হবার পর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের এক প্রোগ্রামে বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশিপের প্রেসিডেন্ট কামরুল ইসলাম সিদ্দিক বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) সাধারণ সম্পাদক আবু নাসেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তারা এ বিষয়ে কি কর্মসূচি নিচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তরে আবু নাসের জানিয়েছিলেন তারা ঠিকমত খোঁজ নিয়ে কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। তারপর প্রায় দেড় মাস অতিবাহিত হয়েছে। আজ পর্যন্ত পরিবেশবাদী কোনো সংগঠনের একটা বিবৃতি পর্যন্ত চোখে পড়েনি। কামরুল ইসলাম সিদ্দিক, ড. আইনুন নিশাত, ড. আসিফ নজরুল, প্রকৌশলী আনম আখতার হোসেন ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের দু-একজন কর্মকর্তা ছাড়া আর কেউ-ই এ বিষয়ে কোনো কথা বলছেন না। পরিবেশবাদী সংগঠন আর সিভিল সোসাইটির কর্তাব্যক্তিরা দেশের ওপর এতো বড় হুমকি থাকা সত্ত্বেও অস্বাভাবিক রকম চুপ কেন? এ প্রশ্ন অনেকেই করেছেন। সরকারের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ হয়েছে। তারপর সরকার কি করছে কেউ জানে না। অথচ এই মুহূর্তে সরকারের উচিত প্রতিটি পদক্ষেপ জনগণকে জানানো। কারণ এই বিপদ মোকাবেলা করতে হলে জনগণকে সঙ্গে নিয়েই করতে হবে। এ বিষয়ে পানিসম্পদমন্ত্রী মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে সময় দিতে পারবেন না বলে জানান। ব্যস্ততার কারণে কোনো মন্তব্য করতেও রাজি হননি। তবে পরামর্শ দেন পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবের সঙ্গে কথা বলতে। পানি সচিব মোঃ সাইফুদ্দিন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'অফিসিয়ালি আমরা এখনও কিছু জানি না। পত্র-পত্রিকার খবরের ওপর ভিত্তি করে যা জানার জানছি। আমাদের জানা মতে, ভারত সরকারের কাছে প্রকল্পটি এখনও ধারণার পর্যায়ে রয়েছে। সাধারণভাবে নিয়ম হলো একটি নদী যতগুলো দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, নদী বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নিতে হলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে জানাতে হয়। আমরা অপেক্ষা করছি। পাশাপাশি ঘটনাক্রমগুলোর ওপর নিয়মিত নজর রাখছি।' এর আগে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রীও সাপ্তাহিক ২০০০কে জানিয়েছিলেন অফিসিয়ালি কিছু জানে না বলে কিছু বলতে পারছেন না। ভারতের হয়তো অফিসিয়ালি জানানোর সময় আসেনি। ব্যাপারটি নিয়ে ভারতে এতো হৈ চৈ হচ্ছে তার ভিত্তিতেও তো পাল্টা আমাদের কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিলো বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সরকারি পর্যায়ে পাল্টা কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। জানা গেছে, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও সরকার ভারতের দৈত্যাকৃতির এই প্রকল্প নিয়ে উদ্বিগ্ন। এ বিষয়ে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সাইফুদ্দিন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমরা একটা স্টাডির কাজ শুরু করেছি। অনেকেই বলছেন বিভিন্ন প্রকার ক্ষতি হতে পারে। বায়োডাইভার্সিটি, ইকোলজিক্যাল, ফিজারিজ ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কি পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে তার একটা ধারণা পেতে চাচ্ছি। এ ধরনের স্টাডি অনেক সময়ের ব্যাপার, তারপরও আমরা ৬ মাসের মধ্যে একটা ধারণা পেতে চাচ্ছি।' এই স্টাডির দায়িত্বে কারা আছেন সে সম্পর্কে পানিসম্পদ সচিব পরিষ্কার করে কিছু বলেননি। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ভারতীয় প্রজেক্টের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নিলে মিডিয়াকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে।

গ্যাস ও ট্রানজিট না পাওয়া : চাপ প্রয়োগের নতুন কৌশল

বিশাল রাষ্ট্র ভারত। দক্ষিণ এশিয়ার সুপার পাওয়ার হলেও সম্পদের অপ্রতুলতা রয়েছে তাদের। ভৌগোলিকভাবেই ভারত পৃথিবীর সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ রাষ্ট্র বলে বিবেচিত হয়। ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে অতি খরা, মরুভূমি, আবার কোথাও অতি বৃষ্টি, বন্যা।

বিশ্ব ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নজর এখন ভারতের দিকে। ভারত নিজেও সেটা বোঝে। যে কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারত সরকার মরিয়া। আন্তঃসংযোগ নদী প্রকল্পের ধারণাটি পুরনো। প্রকল্পটি শুধু নতুনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই প্রকল্প হঠাৎ করেই সামনে আনার পেছনে দিল্লি সরকারের অন্য উদ্দেশ্যও থাকতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন

ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যে পানি নিয়ে বিবাদ দীর্ঘদিনের। সেখানকার প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই নিজেদের এককভাবে শক্তিশালী ও সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চাচ্ছে। ফলে রাজ্যগুলোর একটা চাপ সব সময়ই কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর থাকেই। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক সরকার হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের সুবিধা নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। একক রাষ্ট্র হিসেবে ধনে- বলে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়াটাও ভারতের লক্ষ্য।

বিশ্ব ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নজর এখন ভারতের দিকে। ভারত নিজেও সেটা বোঝে। যে কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারত সরকার মরিয়া। আন্তঃসংযোগ নদী প্রকল্পের ধারণাটি পুরনো। প্রকল্পটি শুধু নতুনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই প্রকল্প হঠাৎ করেই সামনে আনার পেছনে দিল্লি সরকারের অন্য উদ্দেশ্যও থাকতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। কিন্তু স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলছেন না। কারণ হিসেবে তারা বিষয়টিকে স্পর্শকাতর ও আন্তর্জাতিক বলে মানছেন।

বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদের ওপর ভারতের নজর অনেক দিনের। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য বিকাশের ক্ষেত্রে জ্বালানির ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের পরে হঠাৎ করেই আমেরিকান তেল কোম্পানি ইউনোক্যাল গ্যাস ভারতে রপ্তানির জন্য উঠে পড়ে লাগে। শুধু তাই নয়, ইউনোক্যাল ভারতীয় চ্যাপ্টার সে দেশের সরকারের সঙ্গে

চুক্তি পর্যন্ত করে। চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে গ্যাস দিল্লি পর্যন্ত নিয়ে যাবার পরিকল্পনা তাদের।

বাংলাদেশের গ্যাসের ওপর ভিত্তি করে সে দেশের শিল্প, কলকারখানার বিকাশ ঘটাবেন ভারতের এমন পরিকল্পনার কথা দেশবাসী জানে। বাংলাদেশে গ্যাস আবিষ্কারের আগেও তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে গ্যাস আমদানির পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু সেই প্রকল্পগুলো আর্থিক ও কারিগরিভাবে যৌক্তিক না হওয়ায় ভারতকে বাংলাদেশের গ্যাসের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে। ভারতের বিশাল বাজারে নিজেদের ব্যবসা বাড়ানোর জন্য আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠী, আমেরিকা ও বিশ্বব্যাংক গ্যাস রপ্তানির জন্য চাপ দিতে থাকে, যা এখনও অব্যাহত। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে গ্যাস রপ্তানির বিপক্ষে প্রবল চাপ থাকায় সরকার কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অর্থনীতিবিদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'বাংলাদেশের গ্যাস পাবার জন্য ভারত নদীর সংযোগ প্রকল্প উত্থাপন করতে পারে। এটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। এখানে বাণিজ্যই বড় কথা। আন্তঃসংযোগ নদী প্রকল্প যে বাংলাদেশের হত্যার শামিল এটা ভারতও বোঝে। হয়তো চাপ প্রয়োগের জন্যই তারা বিদঘুটে ও দৈত্যাকৃতির এই প্রকল্পকে সামনে এনেছে। আমার ধারণা, কোনো এক সময় ৩৭ নদীর আন্তঃসংযোগ প্রকল্পকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে দর কষাকষি করতে পারে।'

গ্যাস যেমন প্রয়োজন, আসামের বিদ্রোহ দমনের জন্য বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ট্রানজিটও তাদের অতীব প্রয়োজন। ট্রানজিট নিয়ে অনেক দেন-দরবার হয়েছে। কিন্তু ফলপ্রসূ কোনো আলোচনা হয়নি। বাংলাদেশ সরকার ভারতকে ট্রানজিট দিতে রাজি হয়নি। সেভেন সিস্টারস্-এর বিদ্রোহ দমনই নয়, ব্যবসার স্বার্থেও বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে তাদের ট্রানজিট প্রয়োজন। ট্রানজিট এবং গ্যাস দুটোই ভারতের জন্য এখনই প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাতে বাংলাদেশের সঙ্গে দর কষাকষির জন্য আন্তঃসংযোগ নদী প্রকল্প উত্থাপন অসম্ভব নয়। এ বিষয়ে গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশিপ দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশিপের প্রেসিডেন্ট কামরুল ইসলাম সিদ্দিককে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'গ্যাস ও ট্রানজিট ভারতের জন্য অত্যন্ত জরুরি। অন্যদিকে তাদের পানি সমস্যার সমাধান করাটাও জরুরি। যে দৈত্যাকৃতির প্রজেক্ট তারা নিয়েছে, এর ভবিষ্যৎ নিয়ে খোদ ভারতেই বিতর্ক হচ্ছে। পরিবেশবাদীরা এই প্রকল্প থেকে সরকারকে সরে আসার জন্য প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আমার ধারণা, ভারত সরকারও জানতো এ প্রকল্পের কথা জনসম্মুখে এলে বিতর্ক ও প্রতিবাদ হবে। হতে পারে গ্যাস ও ট্রানজিট পাবার জন্য এটা তাদের নতুন কৌশল। আবার নাও হতে পারে। তবে আন্তর্জাতিক সব নীতি লঙ্ঘিত হবে জেনেও তারা যেহেতু এমন প্রকল্প হাতে নিয়েছে, সে ক্ষেত্রে যে কেউ এমন প্রশ্ন উত্থাপন করতেই পারে।'

সুরেশ প্রভু, চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স

রাজনীতিবিদ নয়, পরিবেশবাদী সংগঠন, পরিবেশবিদ, প্রকৌশলী, পানি বিশেষজ্ঞ সাবেক সরকারি কর্মকর্তারা সুরেশ প্রভুর স্বপ্নের এই প্রকল্পের বিরোধিতা করছে। অন্যদিকে টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান সুরেশ প্রভু সবাইকে বিশ্বাস করাতে চাচ্ছেন, প্রকল্পের অর্থায়ন যেকোনো সম্পদ থেকে হতে পারে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ১০১টি জেলা ও ৫টি মেট্রোপলিটন শহরের খাবার পানির সমস্যার সমাধান হবে

গ্যাস ও ট্রানজিট পাবার কৌশল হিসেবে তারা এ প্রকল্প নিয়েছে কি না তা জানতে হয়তো আরও বেশকিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এ আশঙ্কাকে কোনোভাবেই বাতিল করে দেয়া যায় না। গ্যাস, ট্রানজিট না আন্তঃসংযোগ নদী প্রকল্প- এমন প্রশ্ন হয়তো একদিন বাংলাদেশী জনগণের সামনে উত্থাপিত হতে পারে। পাশাপাশি ভারত সরকার যখন জানে এই প্রকল্প নিয়ে দেশ ও দেশের বাইরে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমালোচনার শিকার হতে পারে- তারপরও প্রকল্প গ্রহণের পেছনে অন্য উদ্দেশ্য থাকাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

দেশ বাঁচাতে প্রয়োজন রাজনৈতিক ঐকমত

দেশের ওপর আগত হুমকি শুধু জনগণ আর সরকারের ওপর নয়। এই হুমকি থেকে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, ধনী-গরিব কেউ-ই মুক্ত নয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে যেমন পাকিস্তানি মিলিটারি নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করেছে, এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হলেও একই ঘটনা ঘটবে। ভারতের এই প্রকল্প বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাতের মতো। কেউ কেউ নিউক্লিয়ার বোমার চেয়ে প্রকল্পটি বিধ্বংসী বলে মনে করছে। কারও কারও মতে, বাংলাদেশকে ধ্বংস করার জন্য এটা একটা পরিকল্পিত প্ল্যান। ঘটনা যাই হোক, মূল খবর বা কথা হচ্ছে, ভারত এটা করতে পারে না। প্রথমত, আন্তর্জাতিক কারণে। দ্বিতীয়ত, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র হিসেবে একে অপরের প্রতি অতি দায়িত্বশীল হবে বলেই ধারণা করা যায়। আন্তর্জাতিক নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ বা পানি পরিবহন করে অন্য কোথাও নিয়ে যাবার পরিকল্পনা কোনোভাবেই দায়িত্বশীলতার পরিচয় বহন করে না। এক্ষেত্রে সরকারের চেয়েও ভালো ভূমিকা রাখতে পারে রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটি। বিরোধী রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটি সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করলে সরকার অন্তত এটাকে একটা যুক্তি হিসেবে ভারতের সামনে দাঁড় করাতে পারবে।

সাপ্তাহিক ২০০০ পূর্বের রিপোর্টে দেশের কয়েকজন রাজনীতিবিদকে এ প্রকল্প সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। সে সময় আওয়ামী লীগ, বিএনপি, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ ২০০০কে জানিয়েছিলেন, তারা এ বিষয়ে কিছু জানেন না। ব্যাপারটা দুঃখজনক হলেও সত্য। রাজনীতিবিদরা দেশের আর জনগণের কল্যাণে রাজনীতি করেন বলেই ধরা যায়। কিন্তু দেশের ওপর এতবড় একটা হুমকি, সে সম্পর্কে তারা খবরই রাখেন না। এসব রাজনীতিবিদের কাছ থেকে দেশ কতটা কল্যাণ আশা করতে পারে?

বেদনাদায়ক হলেও সত্য যে, এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোনো দলের বা নেতার একটা প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত কোথাও দেখা যায়নি। দেশের রাজনীতিবিদরা এখনও কি বিষয়টি সম্পর্কে জানেন না? তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কতটা দুর্বল এ থেকেই বোঝা যায়। তারপরও দেশ বাঁচাতে এই রাজনীতিবিদদেরই এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে সরকারকে। ভারত সরকার এই প্রকল্প নেবার পর বিরোধীদলীয় নেত্রী সোনিয়া গান্ধী সমর্থন জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের জনগণও প্রত্যাশা করে নিজেদের মধ্যে যতই বিরোধ থাক, অন্তত এই একটি বিষয়ে শেখ হাসিনাসহ অন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সরকারের পাশে দাঁড়াবে। রাজনৈতিক ঐকমত্য ছাড়া কোনোভাবেই ভারতকে এখান থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব নয়। জনগণকে সচেতন করে তোলার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো ভালো ভূমিকা রাখতে পারে। এ বিষয়ে এখনই ঐকমত্য গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। উদ্যোগটা সরকারি-বেসরকারি উভয় ভাবেই করা যেতে পারে। রাজনৈতিক ঐকমত্য আর নিজেদের ব্যর্থতার কারণে ভারত এই প্রকল্প সম্পন্ন করতে পারলে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা ভেবে দেখার সময় সম্ভবত রাজনীতিবিদদের এসেছে।

কোথায় পরিবেশবাদী আন্দোলন, কোথায় সিভিল সোসাইটি

ওসমানী উদ্যানে গাছ কাটা বিরোধী আন্দোলন দেশের মানুষের মনে জ্বলজ্বল করে। কিংবা ব্রহ্মপুত্র বাঁচাও আন্দোলন। এ সবকিছুই আমাদের সামনে দৃষ্টান্তস্বরূপ। সিলেটে

সিংহবাড়ি রক্ষা পরিষদ, তেল-গ্যাস রক্ষা কমিটি আন্দোলন, যশোরের কপোতাক্ষ বাঁচাও আন্দোলন- অনেক উদাহরণের কথা বলা যায়। বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে বিকশিত হবার পেছনে বিভিন্ন পেশাজীবী ও সামাজিক সংগঠন বা সিভিল সোসাইটির অনেক অবদান রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটি অনেক কম সংগঠিত। তারপরও গত কয়েক বছর বেশকিছু আন্দোলনের নেতৃত্ব সিভিল সোসাইটি দিয়েছে বা দিচ্ছে। রাজনীতিবিদদের ওপর যখন মানুষ আস্থা হারাচ্ছে তখন সমাজকে এগিয়ে নেবার দায়িত্ব সিভিল সোসাইটির। যে দেশের সিভিল সোসাইটি যত সংগঠিত, সে দেশের সমাজ ব্যবস্থা ততটাই গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক। আন্তর্জাতিক নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ করে ভারত ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার পানি বিভিন্ন রাজ্যে নিয়ে যেতে চায়। বাংলাদেশকে শুকিয়ে মারতে চায়। তারপরও পরিবেশবাদী আর সিভিল সোসাইটি চুপ কেন? তারা কেন প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন?

এ বিষয়ে ভারতের ৫৮ জন বিশিষ্ট নাগরিক ভারতীয় নদীর সংযুক্তিকরণ : কিছু উদ্বেগ এবং প্রশ্ন পুস্তিকার মাধ্যমে প্রকল্পের ব্যাপারে তাদের উদ্বেগের কথা প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়িকে জানিয়েছেন। এদের মধ্যে বি.এস. ভবানীশঙ্কর (প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মিনিস্ট্রি অব ওয়াটার রিসোর্সেস, ব্যাঙ্গালোর), ড্যারিয়েল দ্য'মন্টে (চেয়ারপার্সন, ফোরাম অব এনভিরিয়নমেন্টাল জার্নালিস্টস অব ইন্ডিয়া মুম্বাই), রামাস্বামী আর আয়ার (প্রাক্তন সচিব, ভারত সরকার বর্তমানে অবৈতনিক রিসার্চ প্রফেসর, সেন্টার পলিসি রিসার্চ, নতুন দিল্লি), অজিত মজুমদার (প্রাক্তন সচিব, ভারত সরকার, প্রাক্তন সচিব, যোজনা পর্ষদ, প্রাক্তন ডাইরেক্টর, ইকনোমিক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক)। টি এস শংকরণ (প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব, ভারত সরকার নতুন দিল্লি)। ড. সুধীরেন্দ্র শর্মা (পানি বিশেষজ্ঞ, নতুন দিল্লি) এ রকম বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশে মিছিল, মিটিং, সমাবেশ বা সভা-সেমিনারেরও উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বিশেষজ্ঞরা বারবারই সিভিল সোসাইটিকে সংগঠিত হবার কথা জানালেন। কামরুল ইসলাম সিদ্দিকও সিভিল সোসাইটি ও পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোকে সোচ্চার হবার পরামর্শ দেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এই সিভিল সোসাইটি কবে জাগবে? দেশ ধ্বংসের পরে?

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের নেতা আবু নাসের পরিবেশ রক্ষায় অনেক কথা বলেন। তাদের কর্মসূচির কথা বলেন। কিন্তু এই ইস্যুতে তাদের কোনো ভূমিকা চোখে পড়ে না শুধু সেমিনারে কথা বলা ছাড়া। 'বেলা' আরেকটি পরিবেশবাদী সংগঠন। বেলারও কোনো ভূমিকা নেই। অন্য যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি পরিবেশ রক্ষায় রাজপথে বা খবরের কাগজে থাকেন, তারাও আজ কোথাও নেই। এ বিষয়ে ইংরেজি পত্রিকার একজন সাংবাদিক সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এভাবে 'যাদের পথে নামার কথা- তারা দাদাদের কথায় ওঠেন, বসেন। দাদাদের নেয়া প্রকল্পের বিরোধিতা করবেন কোন মুখে? সিভিল সোসাইটি আর পরিবেশবাদী যাদের কথাই বলেন না কেন, নিজেরা কতটুকু লাভবান হবে তা না খতিয়ে তারা কিছু বলবে না।' অন্য সবার মতো আমাদেরও প্রত্যাশা দেশের এই সংকটে ভারতের সিভিল সোসাইটির মতো বাংলাদেশে তারা এই প্রকল্পের বিরোধিতা করে পথে নামবে। ভারতের সিভিল সোসাইটি যে শক্তিশালী, তারা যে বাংলাদেশের প্রতিবাদের পথকে সহজ করে দিচ্ছে এ কথা স্বীকার করলেন বাংলাদেশের পানিসম্পদ সচিব।

ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা

৩৭ আন্তর্জাতিক নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ করার ফলে বাংলাদেশের কি কি ক্ষতি হবে তা সবাই মোটামুটি জ্ঞাত। এক কথায় দেশের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই ধ্বংস প্রক্রিয়া এড়ানোর কি কোনো উপায় নেই? উত্তর হচ্ছে ভারত স্বেচ্ছায় সরে গেলে সবার মঙ্গল। কিন্তু খুব সহজে ভারত সেখানে থেকে সরবে না। দ্বিতীয়ত, ভারতকে সরিয়ে আনতে বাধ্য করা। ১২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের এই প্রজেক্টের অর্থায়ন হবার কথা ছিলো ভারতের অভ্যন্তরীণ খাত থেকে। এখন তা সম্ভব নয় দেখে ভারতীয় টাস্কফোর্স বিশ্বব্যাংকসহ দাতাদের কাছে অর্থ সাহায্য চাচ্ছে বলে জানা গেছে। যে কারণে এই প্রকল্পের সুফল তারা পৃথিবীর বিভিন্ন ফোরামে তুলে ধরছে। বাংলাদেশেরও একই কাজ করা উচিত।

ড. আসিফ নজরুল সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমাদের উচিত পৃথিবীর বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ফোরামে বিষয়টি তুলে ধরা। এ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্যচিত্র নির্মাণ করে বিশ্ব সম্প্রদায়কে দেখানো উচিত আমাদের কি ক্ষতি হতে পারে। বিশ্ব সম্প্রদায়কে বোঝাতে পারলে তারা নিশ্চয়ই বিতর্কিত ও আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনকারী এই প্রকল্পে সমর্থন দেবে না।' আন্তর্জাতিক ফোরামে বিষয়টি নিয়ে যাওয়া একটা পথ। কিন্তু এই পথে সফলতা আনার সম্ভাবনা কম। কারণ কূটনৈতিক দক্ষতা, প্রভাব, প্রতিপত্তি সব দিক থেকেই ভারত এগিয়ে। অতীতে এ পর্যন্ত কোনো বিষয়েই বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে পেরে ওঠেনি। অন্যদিকে আজকের বিশ্ব উন্মুক্ত বাণিজ্যের। বাণিজ্যের স্বার্থেই বিশ্বের প্রভাবশালী সব দেশ ভারতকে সমর্থন দেবে বলে ধারণা করা যায়। ইতিমধ্যেই টেক্সাসের স্টেট অব সেক্রেটারি এই প্রকল্পে ভারতের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ অনেকেই তাদের নিজেদের স্বার্থেই ভারতকে সমর্থন করবে ধরা যায়। তাই সবার আগে প্রয়োজন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। অনেকেই মনে করেন ভারতের কাছ থেকে কিছু পেতে হলে সেটা দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতেই পেতে হবে। গঙ্গাচুক্তির ৯ নং ধারা অনুযায়ীও ভারত আন্তর্জাতিক নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ করে বাংলাদেশকে শুকিয়ে মারতে পারে না। সবকিছুর মূলে হলো ব্যবসা। যে কারণে ভারতের এই প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকসহ অনেকের আগ্রহের কথা শোনা যাচ্ছে। পানিসম্পদ সচিব মোঃ সাইফুদ্দিন বলেন, 'বিশ্বব্যাংক ও এডিবি সীমান্তবর্তী কোনো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে কথা না বলে অর্থ দেয় না। ইআরডি দাতাগোষ্ঠীকে সম্ভাব্য ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করবে, যাতে তারা ভারতীয় এই প্রকল্পে সাহায্য না করে। আমাদের কথা হলো, আমরা নিজেদের শেয়ারের বেশি চাচ্ছি না। আমরা যেনো কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হই এটা নিশ্চিত করাটাই এখন জরুরি।' তিনি গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র ব্যারেজ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। অর্থের অভাবে সেটা সম্ভব নয় বলে জানালেন। ভারত তার প্রকল্প করুক আর নাই করুক, বাংলাদেশকে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। সরকার যদি আন্তরিকভাবে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র ব্যারেজ করে পানি সংরক্ষণ করতে চায় তবে সেটা অসম্ভব নয়। জনগণ এটাই বিশ্বাস করে। অন্যদিকে বিষয়টি দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক। ফলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও পারস্পরিকভাবে আরও আস্থা অর্জনের কাজটি সরকারকেই করতে হবে। কামরুল ইসলাম সিদ্দিক বলেন, 'মূল ব্যাপার হলো ব্যবসা। সুতরাং ব্যবসার জায়গাগুলোতে ইস্যুটি সংযোগ করতে হবে। ভারতের জন্য বাংলাদেশ বড় বাজার। এই বিষয়টি তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। পাশাপাশি ভ্রাতৃপ্রতিম ও বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে তাদেরকে বোঝাতে হবে এই প্রকল্পের ক্ষতির দিক সম্পর্কে। মোট কথা হলো, জনগণ এই ইস্যুতে সচেতন হলে, জনগণের চাপ থাকলে ভারত এই প্রকল্প প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হবে।' সরকার জনগণকে সচেতন করে তুলবে এই প্রত্যাশা সবার। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ও দ্বিপাক্ষিকভাবে এর প্রতিবাদ করে যেতে হবে। তা না হলে মরণ আমাদের ১৪ কোটি মানুষ তথা বাংলাদেশের।

রাজনীতিবিদদের ওপর যখন মানুষ আস্থা হারাচ্ছে তখন সমাজকে এগিয়ে নেবার দায়িত্ব সিভিল সোসাইটির। যে দেশের সিভিল সোসাইটি যত সংগঠিত, সে দেশের সমাজ ব্যবস্থা ততটাই গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক। আন্তর্জাতিক নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ করে ভারত ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার পানি বিভিন্ন রাজ্যে নিয়ে যেতে চায়। বাংলাদেশকে শুকিয়ে মারতে চায়। তারপরও পরিবেশবাদী আর সিভিল সোসাইটি চুপ কেন